



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.64-72

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

কবিগান ও রামায়ণী সংস্কৃতি: রাঢ়ের লোকায়ত ঐতিহ্যের বিশিষ্ট নমুনা

ড. সুবীর ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Kabigaan is one of the prominent music genres of undivided Bengal. Kabigaan is basically a song sung by a poet. However, this poet must be a folk-Poet. The uneducated or semi-educated people in the society are the Poets of Kabigaan, who are still carrying forward this prominent genre of music in parallel. The poets of Kabigaan are called Kabiwala or Kabiyaal. Kabigaan is performed through a pala-based musical struggle, and each kabiyaal is said to be equal to the opposing palladars, who are also called palladars. Many also call them Charadar because the palladars cut the rhyme (chara) and serve the kavigan. Kavigan is a competitive musical struggle between the two groups. Kabigaan is more famous in the countryside as a 'Kabir-Larai' than a Kabigaan. Because the fight of Kabigaan is the main and subsistence and the main enjoyment of the audience. This fight is through rhythmic music and focuses on specific topics. The main singer of the group is Kabiyaal or Kabiwala. At present, they are more proud to introduce themselves as 'charan-Kabi'. In addition to the Kabiyaal, there is a group of Kabidal with two dohars and one dhuli. The Kabiyaal wears a dhoti-Punjabi, and a sash around his neck. The rest of the members of the Kabidal also usually wear dhoti-Punjabi. Sometimes everyone wears a garland of flowers around their necks. At the beginning of the Kabigaan, the Dohars established the Asar through Gaur-Chandrika before the Kabiyaal's Asar. Dohars are associate musicians. They are also called juridar because they play juri or claps. Many also play the harmonium or any other musical instrument. However, the main musical instrument of Kabigaan is the Bengali Dhol. Among those who play musical instruments in Kabigaan, Dhuli has the most role. When the Kabigaan is immersed in the melody of the kabiyaal, the Kabigaan becomes very lively with the skillful rhythm of the Dhol. The important Pala in Kabigaan is the Pala of Ramayana. Where the main purpose of the poets is to inculcate Ram's Majesty Kirtan and devotion.

Key Word – genres, Palladars, Kabir-Larai, Gaur-Chandrika, juridar, Majesty

কবিগান অঞ্চল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সংগীতধারা। মূলত কবিগায়কের গাওয়া গানই কবিগান। তবে এ কবি অবশ্যই লোকজ কবি। সমাজের অন্তর্বাসী অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষই কবিগানের কবি, যারা এখনও এই বিশিষ্ট সংগীতধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সমানতালে। কবিগানের কবিদের কবিওয়ালা বা

কবিয়াল বলা হয়। পালাভিত্তিক সঙ্গীত-সংগ্রামের মাধ্যমে কবিগান পরিবেশিত হয় এবং প্রত্যেক কবিয়াল বিপক্ষ পাল্লাদারদের সমানে সমানে পাল্লা দেন বলে, তাদের পাল্লাদারও বলা হয়। পাল্লাদাররা ছড়া কেটে কেটে কবিগান পরিবেশন করেন বলে অনেকে তাদের ছড়াদারও বলে থাকে। কবিগান দু'দলের প্রতিযোগিতামূলক সঙ্গীত-সংগ্রাম। কবিগান অপেক্ষা 'কবির লড়াই' হিসাবেই গ্রামাঞ্চলে কবিগানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধি। কেননা কবিগানের লড়াইটাই মুখ্য ও উপজীব্য এবং দর্শক-শ্রোতার প্রধান উপভোগ্য। এই লড়াই হয় ছন্দ-লয়-তাল সমন্বিত সংগীতের মাধ্যমে এবং নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে। তবে লড়াই না বলে একে সুরারোপিত বাকযুদ্ধ বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। কবিদলের প্রধান গায়কই কবিয়াল বা কবিওয়াল। বর্তমানে তারা নিজেদের 'চারণকবি' বলে পরিচয় দিতেই বেশি গৌরববোধ করেন। প্রধান কবিয়াল ছাড়াও দু'জন দোহার ও একজন ঢুলি নিয়ে হয় এক একটি কবির দল। প্রধান কবিয়ালের পরনে থাকে ধুতি-পাঞ্জাবি, আর গলায় থাকে উত্তরীয়। কবিদলের বাকি সদস্যরাও সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবিই পরে থাকেন। কখনও কখনও গলায় ফুলের মালাও ধারণ করে থাকেন সকলে। কবিগানের শুরুতে প্রধান কবিয়ালের আসরে ওঠার আগেই দোহারগণ গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে আসর পত্তন করেন। দোহাররা হলেন সহযোগী সংগীতশিল্পী। আসর পত্তন ছাড়াও প্রধান কবিয়ালকে গানে সঙ্গত করাই হল তাদের মূল কাজ। তাদের হাতে থাকে মন্দিরা বা করতাল বা জুড়ি। জুড়ি বাজায় বলে তাঁদের জুড়িদারও বলা হয়। আবার অনেকে হারমোনিয়াম বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রও বাজিয়ে থাকেন। তবে কবিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্রই হল বাংলা ঢোল। কবিগানে যারা বাদ্যযন্ত্র বাজান, তাদের মধ্যে ঢুলির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কবিয়ালের ছন্দ-সুরের চমৎকারিত্বে কবিগান যখন জমে ওঠে, তখন ঢুলির নিপুণ ছন্দের তালে কবিগান ভীষণভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

কবিগান মৌখিক সাহিত্য। লিখিত পাঁজিপুঁথি থাকলেও মৌখিক উক্তি-প্রত্যুক্তিই কবিগানের প্রাণ। কবিগানের আসরে দাঁড়িয়ে গুরুপ্রদত্ত মুখস্থ বুলি আছে মাত্র চার আনা। বাকি বারো আনাই কবিয়ালদের তাৎক্ষণিক সৃষ্টি। অন্যান্য লোকায়ত গানেও এই সামান্য লিখিত পাঁজিপুঁথি অনিবার্য ভাবেই থাকে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, অন্যান্য লোকায়ত সংগীত অপেক্ষা কবিগানের বিস্তার অনেক বেশি। একজন কবিয়ালকে রামায়ণ, মহাভারত, আঠারোটি পুরাণ, আঠারোটি উপপুরাণ, বেদ, কোরান, হাদিস, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যচরিত সাহিত্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত কিছুই সঙ্গ্রে পরিচিত থাকতে হয়। কেননা কবিগানের আসরে কোন পালায় কোন বিষয়ে গান হবে তা কবিয়ালরা আগাম জানতে পারেন না। তাই পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই আসরে নামতে হয়। যে কবিয়াল যত বেশি বিষয়কে আয়ত্ত করতে পারেন, কবিগানের আসরে সেই কবিয়াল তত বেশি দর্শক-শ্রোতার জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হন। একজন কবিয়ালের পক্ষে সব শাস্ত্রের সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে জানা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে নবীন কবিয়ালদের পক্ষে এত শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করা তো কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আর তখনই প্রয়োজন পড়ে গুরুর। গুরুর কাছে শাস্ত্রালোচনা শুনে শুনেই প্রাথমিক ভাবে একজন কবিয়াল নিজেকে তৈরি করেন। তারপর শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে হয়। কিন্তু অনেক অক্ষর জ্ঞানহীন কবিয়ালও দেখা গেছে, যারা নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেও, কেবল গুরুপ্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কবিগানের আসরে দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

কবিগান দীর্ঘ সময়ের গান। আসরে দাঁড়িয়ে কবিয়াল যা কিছু বলেন, তা সবই প্রায় সাহিত্য। প্রত্যেকটি কথাই ছন্দের গাঁথুনিতে আবদ্ধ। গৌরচন্দ্রিকা থেকে শুরু করে ছড়া, পাঁচালি, পয়ার - কোনোটিই ছন্দের বাইরে নয়। এই ছন্দ কখনও দ্বিপদী, কখনও ত্রিপদী বা চৌপদী। ঢুলির ঢোলের বাজনা এই ছন্দকে

আগাগোড়া ধরে রাখে। শুধু ছন্দ নয়, কবিগানের প্রতি ছত্রে রয়েছে অলংকার। অনুপ্রাস অলংকার ছাড়া কবিগান হয় না। কবিগানের আসরে ঢোলের বোলের সঙ্গে তাল রেখে কবিয়ালের ধনিঝংকারবহুল অনুপ্রাস অলংকারের আতিশয্য নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। পয়ার তৈরির কৌশল না জানলে কোনো ভাবেই কবিগান করা যায় না। আর পয়ারে অন্ত্যানুপ্রাস থাকবেই। শুধু তাই নয়, ত্রিপদী ছড়াতেও আমরা সেই অনুপ্রাস অলংকারের বাড়াবাড়ন্ত সহজেই দেখতে পাই। এছাড়া যমক, শ্লেষ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ব্যঙ্গস্তুতি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শব্দালংকার ও অর্থালংকাই কবিগানে আছে। পাশাপাশি কবিগানে এমন কিছু দেহতত্ত্বের গান আছে, যার ব্যঞ্জনা কোনো অভিজাত সাহিত্যের থেকে কম নয়। কবিগান মিশ্রীতির সংগীতকর্ম, যার মধ্যে বাউল গানের অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির স্পর্শ যেমন পাই, কীর্তনের ভক্তিভাব যেমন পাই, তেমনি নাটকের সংলাপধর্মিতা এবং নাট্যদ্বন্দ্বেরও আভাস পাওয়া যায়। কবিগানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কবিয়ালি গল্প। এই গল্প খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভীষণই ইঙ্গিতগর্ভ। গল্পগুলি অনেক সময় রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ কাহিনি আশ্রিত, কখনও বা বাস্তব জীবনাশ্রিত। তাছাড়া, বিবিধ রামায়ণ, বিবিধ মহাভারত, পুরাণ, কোরান, ভাগবত, জীবনী সাহিত্য, বা আধুনিক সাহিত্যের যে দিক নিয়েই কবিগানে আলোচনা হোক না কেন, সেখানেও কাহিনি বা আখ্যান থাকবেই। এই সমস্ত বিচিত্র কাহিনির বিচিত্র চরিত্রের উত্থান-পতন, পৌরুষের আস্ফালন, ট্রাজিক আবেদন, ভক্তি তন্ময়তা - সমস্ত কিছুই দর্শক-শ্রোতার পরম উপভোগ্য সামগ্রী। কবিগানে বিষয়ের বিস্তার খুব বেশি। আমাদের আলোচনার বিষয় যেহেতু কবিগানে রামায়ণী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা, তাই কবিগানের মধ্যে রামায়ণকথা কীভাবে আলোচিত হয়, রামায়ণ কাহিনিকে কীভাবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হয়, রামায়ণের প্রতীকধর্মীতা কবিয়ালরা কেমন ভাবে দর্শক-শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করে লোকশিক্ষা দান করেন, সেগুলিই আলোচনার বিষয়।

রামকাহিনি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রামায়ণ লিখিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই রামকথা তথা রাম মাহাত্ম্য জনমানসে বেশ কিছুটা জায়গা অধিকার করে ছিল। রামকথা লিখিত রূপ পাওয়ার পরে পরেই এই লোকজ মৌখিক ধারার পাশাপাশি লিখিত ভারতীয় সাহিত্যও শতধারায় বিকশিত হয়ে উঠল। ফলে রামকথার দুটি পৃথক ঐতিহ্য (একটি লিখিত, অপরটি মৌখিক) সমগ্র ভারতবর্ষের আপামর মানুষের জীবনবোধ, আদর্শ, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য সমস্ত কিছুকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে তুললো। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ কাহিনির অনুবাদ হয়েছে এবং রামায়ণ অনুসরণে একাধিক সাহিত্যিক মহাকাব্য লিখিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরেও মূল সংস্কৃত রামায়ণ নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে। রামকথাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য কাব্য, নাটক লিখিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সংস্কৃত রামায়ণ লিখিত হওয়ার পর তার অধিকাংশ অনুবাদই হয়েছে মধ্যযুগে। তবে রামায়ণের এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিজাত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করলেও, লোকজ সংস্কৃতিতে রামকথার মৌখিক ঐতিহ্যই এখনও ক্রিয়াশীল। নিকট অতীতে বাংলার গ্রামে গঞ্জে যে রামযাত্রা, রামায়ণ গান, পটের গান, পালাগান, রাবণবধ পালা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত এবং এখনও কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত হয়, এগুলি রামায়ণের মৌখিক ঐতিহ্যেরই ফসল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই বাঙালির এই গর্বের ঐতিহ্য আজ কিছুটা হলেও ধ্বংসের পথে। আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থাকে এর জন্য কিছুটা দায়ী করা যেতে পারে। তবে লোকঐতিহ্যে এবং লোকজ মানুষের চিন্তাচেতনায় রামকথার প্রভাব কোনোভাবেই শেষ হওয়ার নয়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল গ্রামবাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন রামায়ণ কেন্দ্রিক লোকগান বা লোককথা। কবিগান

তেমনি একধরনের লোকায়ত সংগীত, যেখানে রামকাহিনিকে আশ্রয় করে দুই প্রতিপক্ষ কবিয়াল বিভিন্ন পালায় কবিগান পরিবেশন করেন।

অন্যান্য লোকগানের মতো কবিগানেও রামকথার প্রচলিত লৌকিক ধারারই প্রাধান্য। তবে মৌখিক ধারার পাশাপাশি কবিয়ালদের রাম কাহিনির লিখিত ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত থাকতে হয়। অন্যান্য লোকশিল্পীদের তুলনায় কবিয়ালরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত। শিক্ষিত এই অর্থে কবিয়ালদের অনেকবেশি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কবিগানের আসরে নামতে হয়। তার উপর রয়েছে গুরুমুখী শিক্ষা বা গুরু প্রদত্ত জ্ঞান। কবিগান পুরোপুরি Perfuming Art। তাই জ্ঞানের ভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ হবে, কবিয়ালদের খ্যাতিও ততই বাড়বে। ঠিক এই কারণেই শুধু বাল্মীকি রামায়ণ বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নয়, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, আধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, রামরসায়ণ, কখন রামায়ণ সমস্ত কিছুর সঙ্গেই কবিয়ালদের পরিচিত থাকতে হয়। বিশেষত কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কাহিনি না জেনে কবিয়ালরা আসরেই নামতে পারবেন না। মনে রাখা দরকার কবিগান দ্বন্দ্বমূলক বাকবিতণ্ডা ও চাপান-উতোরের গান। যেখানে কবিয়ালরা রামকাহিনির যে কোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন করে বিপক্ষ কবিয়াল বা বিপক্ষ পাল্লাদারকে পর্যুদস্ত করতে পারেন। সুতরাং রামকথা ভালোভাবে আত্মস্থ না করে গান করতে নামার অর্থ নিজের আত্মসম্মানের প্রতি অবিচার করা এবং দর্শকশ্রোতার হাসির পাত্র হওয়া। যেটা কোনো কবিয়ালই হতে চান না।

রামায়ণ কেন্দ্রিক কবিগানের মূলকথাই হল রাম মহাত্ম্যের ব্যাখ্যান। রাবণ অনার্যশ্রেষ্ঠ, রাম আর্য়কুলরবি এঁদের মাঝখানে আছে সীতা। কবিওয়ালারা রামায়ণের রূপকার্থের দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই দর্শক-শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করেন। এই রূপকার্থ কখনও শাস্ত্রীয় বা আধ্যাত্ম জ্ঞান সমন্বিত, কখনও বা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। সীতা অর্থে রেখা, একথা সকলের জানা।

“জনক রাজার হলমুখে তাঁর উৎপত্তি এবং তাঁর পাতাল প্রবেশ কাহিনীর দ্বারাও সীতার স্বরূপার্থ সমর্থিত হয়। রামের দুর্বাদলশ্যাম বর্ণের দ্বারা সহজেই বোঝা যায় রাম বস্তুতঃ কৃষিজাত শস্য শ্যামল রমণীয়তারই প্রতীক।”^১

রাম তত্ত্বকে অধিকাংশ কবিয়াল রমণ তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বীরভূমের প্রখ্যাত কবিয়াল সদানন্দ যশের ব্যাখ্যায় রাম হল রমণের কর্তা। যেখানে আরাম, বিরাম, চিরশান্তি। র-এ রস, ম-এ মন্থন, ন-এ আনন্দ। দেহের রসকে মন্থন করে নায়ক নায়িকার মাঝখানে আনন্দ দেওয়া-নেওয়ার নামই হল রমণ। মানুষ রামকে জানার জন্য রমণ তত্ত্ব যায়। কিন্তু সঠিক পথ না জানলে রমণ না হয়ে বমন হয়ে যায়। রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন - একের মধ্যেই চার, চারের মধ্যেই এক। রাম হল দেহের আনন্দ অংশ, লক্ষ্মণ লক্ষ্যবস্তু, ভরত ভার অপহরণকারী, শত্রুঘ্ন শত্রুনাশক। সীতা হল ব্রহ্মসত্তা, রাবণ হল দুরন্ত কাম, আর বিভীষণ হল বিবেক। বিবেক জাগ্রত না হলে রামকে পাওয়া যায় না। বর্ধমান জেলার কবিয়াল অজিত কর্মকার সীতাকে ব্যাখ্যা করেছেন উর্বরা ভূমির প্রতীকে। রাম তাঁর কাছে সৌন্দর্য ও রমণীয়তার আধার, আর লক্ষ্মণ কল্যাণময় সম্পদ। শুধু কবিয়াল অজিত কর্মকার নয়, শিক্ষিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ কবিয়াল মাদ্রেই রাম-সীতাতত্ত্বকে দেখেন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোন থেকে। শিক্ষিত কবিয়ালমাদ্রেই রামায়ণের রূপকার্থের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের কৃষিসভ্যতার বিকাশের প্রধান কাণ্ডারি যে রাম এবং সীতা যে শস্যশ্যামলা ভূমির প্রতীক এই ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জাভাযাত্রীর পত্র’ রচনায় সপ্তম পত্রে রামায়ণের রূপকের এই দিকটিই ইঙ্গিত করেছেন - “রামায়ণের

রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদুর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয় ভাইবোন, তারা পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।”^২

একই কথা পাই ‘পরিচয়’ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ রচনায়। কবিগানের আসরে কবিয়ালদের মূল অবলম্বন লোকজ সাহিত্য ও লোকজ দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকই। তাই বলে অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে কবিয়ালদের কোনো বিরোধ নেই। অন্য লোকসাহিত্যের সঙ্গে কবিগানের এখানেই পার্থক্য যে কবিগানের আসরে কবিয়াল লোকজ ও অভিজাত সমস্ত কিছুকেই আত্মীকরণ করতে চায়। তাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীতা যে Fertility Cult এর প্রতীক তাকে মেনে নিয়েই অধিকাংশ কবিয়াল আসরে নামেন। আর আলোচনা প্রসঙ্গে রাম-সীতার সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন কবিয়ালরা। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কবিয়ালদের দৃষ্টিভঙ্গিও যেন অনেকাংশে মিলে যায়। যেখানেই সীতা সেখানেই সৌন্দর্য ও সম্পদের সহাবস্থান। কিন্তু এই ভূমি যদি হাল চালানোর অনুপযোগী উষ্মর পাষণভূমি হয়, অনেকটা পাষণী অহল্যার মতো, তখনই তো প্রয়োজন হয় রাম অবতারের। তাই রামের আবির্ভাব কেবলই রাবণ নিধনেই সীমাবদ্ধ নয়। রাম হল পতিতপাবন অনাথের নাথ। তাই শ্রীরামতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে যে সমস্ত পাঁচালি গান কবিয়ালরা আসরে গেয়ে থাকেন তেমনই একটি গান উদ্ধার করা হল -

কোথা হে মাধব, অনাথের বান্ধব,

রঘুপতি জানকীনাথ শ্রীগোবিন্দ -

কোথা হে মাধব ।(প্রঃ)

প্রথম কলি - পড়ে মায়ার বশে, মজে বিষয় বিষে,
দর্প অহংকার আমায় ঘিরে বসে,

উপায় কিবা আমার হবে অবশেষে,
বন্দি অষ্টোপাসে কেমনে পার হবো,
কোথা হে মাধব -

দ্বিতীয় কলি - ভুলে গিয়ে আমি সেই যে পরমার্থ,
দিবা নিশি ভাবি পার্থিব এ অর্থ,
অর্থ অর্থ করে জীবন হল ব্যর্থ,
কখন পরমার্থ হৃদয়ে জাগাবো ?

কোথা হে মাধব -

তৃতীয় কলি - সদয় হয়ে দেখা দাও গোন্ধ বিহারী,
শ্রীরাম রূপে, এলে হয়ে ধনুকধারী,
কী তব মহিমা বর্ণিতে কি পারি ?
কাষ্ঠতরি সোনা পর্শিয়ে পাদব,

কোথা হে মাধব -

চতুর্থ কলি - অহল্যা পাষণী মুক্তি পদ পেলে,
করিলে যে দয়া গুহক চণ্ডালে,
রঘুকুল তিলক পতিত পাবন বলে,

আমি পতিত বলে ভুলো না রাঘব,
কোথা হে মাধব -
পঞ্চম কলি - একাংশ হইতে হইলে চারি অংশ,
ধরাধামে তুমি হইলে অবতংশ,
ধন্য দশরথ রাজা সূর্যবংশ,
রাবণ বংশ উদ্ধারনে ইচ্ছা মনে তব,
কোথা হে মাধব -
ষষ্ঠ কলি - যোগী মুনি ঋষি পায়না বসে ধ্যানে,
অনন্ত মহিমা দিগন্ত মাঝখানেে,
শিব ব্রহ্মা বসে চিন্তে যোগাসনে,
বসিয়াছে ধ্যানে ভেবে না পাই ভব,
কোথা হে মাধব -
সপ্তম কলি - তুমি অচিন্ত প্রভু কে পারে চিনিতে,
কত খেলা খেল খেলার এ জগতে,
দুষ্টের দমন কর্তা শিষ্টের পালিতে,
নিরাকার সাকার, তুমি যে বান্ধব
কোথা হে মাধব -
অষ্টম কলি - রক্ষোকুল তুরাতে লঙ্কায় যে আগমন,
বৈকুণ্ঠ বিহারী তুমি হে নারায়ণ,
সঙ্গে লয়ে যত বানর সৈন্যগণ,
রত্নাকরে বন্ধন করিলে কেশব,
কোথা হে মাধব -
নবম কলি - একবার যদি কেউ বলে রামনাম,
জীবন সফল হবে পুরে মনস্কাম,
ত্রিতাপ আদি ব্যাধি সকলি আরাম,
কৈবল্যধাম শমন হবে পরাভব,
কোথা হে মাধব -
দশম কলি - দীনে দয়া করো দিগে দরশন,
পাপ দেহ পবিত্র করো পতিত পাবন,
জানকীবল্লভ তুমি রাজীবলোচন,
তোমার রাতুল চরণ আমি কবে পাবো?
কোথা হে মাধব -
একাদশ কলি - রিপু শত্রুগণে কবে বিজয় পাবো ?
নয়নবারি দিগে চরণ ধুয়াবো,
ভক্তি পুষ্প তুলে চরণে অর্পিব,
সমূলে বিকাবো আমি না থাকিব,

কোথা হে মাধব -

দ্বাদশ কলি - যুগল মিলন হবে লয়ে সীতা-রামে
 ঐ রূপ মুরতি হেরি গো অস্তিমে,
 বৈদ্যনাথের আশা কবে পাবো রামে,
 সীতা সহ রামে চরণ সেবিবো,
 কোথা হে মাধব।^৩

কবিগানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ঘাত-প্রতিঘাতই প্রধান। তাই পালা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই সব পালাতেই কবিগান বেশি হয়, যেখানে চরিত্রগুলির মধ্যে কিছুটা সংঘাত বা টানাটানা পোড়েন থাকে। রামায়ণের ক্ষেত্রে এইসমস্ত পালাগুলি হল রাম-রাবণ, রাম-তারা, রাম-মন্দোদরি, রাবণ-মন্দোদরি, রাবণ-হনুমান, রাবণ-অঙ্গদ, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, রাবণ-বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ-বিভীষণ, লক্ষ্মণ-ইন্দ্রজিৎ, সীতা-সরমা, সরমা-শূর্পণখা প্রভৃতি। এই পালাগুলির কোনটি ঘটনা প্রধান, আবার কোনোটি ভাব প্রধান। এই ভাব যে ভক্তিভাব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে রামায়ণ কেন্দ্রিক সব পালাই এসে থামে ভক্তিভাব এবং রামের প্রতি আত্মনিবেদনে। এমনকি রামের বিপক্ষ চরিত্রে গান করেও কবিয়াল কতখানি আত্মনিবেদন করছে বা ভক্তি বিহীনতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে তার উপরই নির্ভর করে কবিয়ালের গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা। রামায়ণ কেন্দ্রিক কবিগান দাঁড়িয়ে আছে মূলত রাম-রাবণের লড়াইকে কেন্দ্র করে। এখানে দুটি পক্ষ - একটি রাম পক্ষ, অপরটি রাবণ পক্ষ। রামায়ণের যে বিষয়েই গান হোক না কেন তা দাঁড়ায় এসে রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত মূলত সীতাহরণকে কেন্দ্র করে। পরস্পরি হরণ করে রাবণ খুবই গর্হিত কাজ করেছে। ফলে নিজের এবং সমগ্র লক্ষ্মধামের অমঙ্গল ডেকে এনেছে। অর্থাৎ রাবণ যেন অধর্মের প্রতিভূ, আর রাম ধর্মের ধ্বজাধারী। কিন্তু কবিগান দ্বন্দ্বমূলক সংগীত সংগ্রাম, - যেখানে যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, জল্পনা-কল্পনা ও সংগীতের মাধ্যমে নিজের চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলাই কবিয়ালদের প্রধান কাজ। তাই রাবণ বা রাবণপক্ষ নিয়ে যারা গান করেন, তারাও রাবণ চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তোলেন নিজস্ব বাচনিক ভঙ্গিমায়। কবিগানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রায় সমস্ত কবিয়ালই রামায়ণের নির্ধারিত পালায় প্রবেশের আগে রামায়ণ কেন্দ্রিক পালাগুলির নাম পরিচয় গানের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। তেমনই একটি গান বর্ধমান জেলার কবিয়াল তপন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। গানটি এরূপ -

মহাকাব্য রামায়ণে যদি মোরা গাই দুজনে
 যেখানে রঘুপতি রাজীব লোচন।
 অধর্ম বিনাশিতে আপন ধর্ম উদ্ধারিতে
 ত্রেতার মাঝে অবতীর্ণ হন।।
 তাই একপক্ষে রঘুনন্দন বিপক্ষে তার শ্রীদশানন
 ঘোর রণ বাঁধলো লক্ষ্মাপুরে।
 যার সহায় হয়ে হনুমান ইন্দ্রজিতে বাবা বলান
 বাঁশ বনে যেদিন বাঁধা পড়ে।।
 তাই রাবণ আর বিভীষণ, করলে পরে সীতাহরণ
 রোদন করে লক্ষ্মীর লাঞ্ছনা।
 বলে, দাদা রামের সীতে ফিরিয়ে দাও লক্ষ্মার হিতে

আছে স্ববংশেতে নিধনের ভয়।।
 না করিয়া কর্ণপাত করেছিলেন পদাঘাত
 আঘাত পেয়ে বিভীষণও ধায়।
 দিল ছিদ্রের অশ্বেষণ যাতে হয় রাবণ নিধন
 ঠাঁই পেয়ে রাজীবেরই পায়।।
 আবার শুনি ঐ কারণে মন্দোদরী আর রাবণে
 লেগেছিল বাক্যের লড়াই।
 সরমা আর শূর্ণনখা একই পথে লাগলো ঠোঁকা
 বলে, ননদী তোর লজ্জা বলতে নাই।।^৪

রাবণ অনার্যশ্রেষ্ঠ, রাম আর্যকুলরবি। এদের মাঝখানে আছে সীতা। আসলে রামায়ণ মহাকাব্যটিরই কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সীতা। সীতাহরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক কবিয়ালই সীতাকে রাবণের কন্যা বলে দাবি করেন। এক্ষেত্রে ‘অদ্ভুত রামায়ণে’র কাহিনি অবশ্য তেমনিই ইঙ্গিত দেয়।^৫ আর কবিয়ালরা ক্ষেত্রবিশেষে তাকেই অবলম্বন করেন। অনেক আধুনিক মনস্ক কবিয়াল সীতাহরণকে ব্যাখ্যা করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে। এমনকি রাম-রাবণের দ্বন্দ্বকেও তারা অন্যভাবে উন্মোচন করেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ তাঁদের কাছে আর্য-অনার্যের লড়াই হিসাবেই প্রতিভাত হয়। আর এই লড়াই যে ভূমির লড়াই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সীতা এখানে ভূমির প্রতীক। কখনও বা শস্যদায়িনী লক্ষ্মীরূপেও সীতা প্রতিভাত হয়। আবার অনেক কবিয়ালের কাছে রাবণের সীতাহরণকে নারীর প্রতি লাঞ্ছনা প্রতিপন্ন করে পাপ বলে দেগে দেওয়া হয়, তাও সঠিক নয়। তাঁদের যুক্তি, গঙ্গা তো নারী, পরদ্বী। তাঁকে কত মানুষই হরণ করে ঘরে নিয়ে যায়। কিন্তু তা কি কখনো অপরাধের পর্যায়ে পড়ে? সুতরাং রাবণও সীতাহরণ করে কোনো অপরাধ করেননি। আবার এই ব্যাখ্যাকেই কোনো কোনো কবিয়াল চরম আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নিয়ে রাবণপক্ষের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেন। তাঁদের বক্তব্য, রাবণ সীতাকে মাতৃজ্ঞানে নিয়ে এসেছে এবং বন্দি করে রেখেছেন অশোকবনে। অশোকবন যেখানে শোকের স্থান নেই। এক্ষেত্রে রাম পক্ষের কবিয়াল কবিয়াল রাবণ পক্ষের কবিয়ালকে প্রশ্ন করতে পারেন, যদি মাতৃজ্ঞানেই সীতাহরণ হয়, তবে সীতাকে ভার্জ্যা করতে চাওয়ার যুক্তি কী? আর কেনই বা সীতার উপর এই পাশবিক অত্যাচার? এ বড় জটিল প্রশ্ন। কিন্তু কবিগান যেহেতু হার না মানার খেলা। তাই রাবণ পক্ষের কবিয়ালকেও এর প্রতিযুক্তি তৈরি করে রাখতে হয়। এভাবেই রামায়ণ প্রসঙ্গ কবিগানে একটি অন্যরকম সংস্কৃতি তৈরি করে, যেখানে রাম নায়ক এবং রাবণ খলনায়ক - এই প্রথাগত মিথ পুনর্নির্মিত হয় কবিয়ালদের গায়কী চণ্ডের চমৎকারিত্বে।

তথ্যসূত্র:

- ১) ‘রামায়ণ ও ভারতসংহতি’, প্রবোধচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা, কল - ৯, প্রথম প্রকাশ - ১৩৬৯, পাতা - ৯
- ২) ‘জাভায়াত্রীর পত্র’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭৫, পাতা- ৪৭৩
- ৩) ব্যক্তিগত সংগ্রহ, অগ্রহায়ণ ১৪২০, চুরপুনি, পূর্ব বর্ধমান। গানটি কবিয়াল বৈদ্যনাথের ভনিতায় চুড়পুনি গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন সাহার খাতা থেকে পাওয়া গেলেও আসল রচয়িতা কে বলা শক্ত। তবে রচনাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে গানটি কিশোরী ওস্তাদের লেখা বলে মনে হয়।

- ৪) ব্যক্তিগত সংগ্রহ, তপন চট্টোপধ্যায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত, কোশীগাম, পূর্ব বর্ধমান। ভাদ্র ১৪২০।
- ৫) 'রামকথা বিকাশের ধারা'(প্রথম পর্ব), শ্রী প্রবোধকুমার মাইতি, ভূর্জপত্র, কল - ৪, প্রথম প্রকাশ - ১৩৯২, পাতা - ৫৬